অধ্যায় - ২৮

পাখীদের শিরডীতে টেনে আনা - ১) লক্ষ্মীচন্দ ২) বুরহানপুরের মহিলা ৩) মেঘার নির্বাণ।

শ্রী সাই অনন্ত। তিনি একটা পিঁপড়ে থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সর্বভূতে ব্যাপ্ত। বেদ ও আত্ম বিজ্ঞানে পূর্ণ পারঙ্গম হওয়ার দরুণ তিনি ছিলেন সদ্‌গুরু উপাধির সম্পূর্ণ যোগ্য। বিদ্বান হয়েও যদি গুরু নিজের শিষ্যকে সজাগ করে তাকে আত্মস্বরূপের দর্শন না করাতে পারেন, তাহলে তাঁকে সদ্‌গুরু নামে কদাপি সম্বোধন করা যায় না। সাধারণতঃ, পিতা কেবল এই নশ্বর শরীরেরই জন্মদাতা। কিন্তু সদ্‌গুরু জন্ম ও মৃত্যু-দুটোর থেকেই মুক্তি পাইয়ে দেন। অতএব তিনি অন্য লোকেদের চেয়ে বেশী দয়াবন্ত।

শ্রী সাইবাবা সব সময় বলতেন- **“আমার ভক্ত এক হাজার ক্রোশ দূরে থাকলেও শিরডীর টানে এইভাবে আকর্ষিত হয়ে চলে আসে, যেমন সূতোয় বাঁধা চড়াইপাখী নিজেই চলে আসে।”** এই অধ্যায়ে এমনি তিনটি পাখীর বর্ণনা করা হয়েছে।

১) লালা লক্ষ্মীচন্দ ঃ-

এই ভদ্রলোক বম্বের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর প্রেসে চাকরী করতেন। সেই চাকরীটা ছেড়ে উনি রেল বিভাগে আসেন এবং তারপর মেসার্স রেলী ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানীতে কেরাণীর চাকরীতে ঢোকেন। ১৯১০ সালে ওঁর শ্রী সাইবাবার সাথে যোগাযোগ হয়। বড়দিনের (ক্রিসমাস্) প্রায় মাস দুই আগে সান্তাক্রুজে থাকাকালীন একটি স্বপ্ন দেখেন- এক দাড়ীওয়ালা বৃদ্ধকে ভক্তরা ঘিরে বসে আছে। এই ঘটনার কিছুদিন পর উনি নিজের বন্ধু শ্রী দত্তাত্রেয় মঞ্জুনাথ বিজয়ের বাড়ীতে দাসগণুর কীর্তন শুনতে যান। শ্রী দাসগণুর একটা নিয়ম ছিল যে, উনি কীর্তন করার সময় শ্রোতাদের সামনে শ্রী সাইবাবার ছবি নিশ্চয়ই সাজিয়ে রাখতেন। লক্ষ্মীচন্দ এই ছবিটি দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হন, কারণ স্বপ্নে দেখা বৃদ্ধটির আকৃতি হুবহু এই ছবিটির মতন ছিল। ওঁর বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, যিনি স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন তিনি শ্রী সাইনাথ ছাড়া আর কেউ নন। চিত্র-

দর্শন, দাসগণুর মধুর কীর্তন এবং সন্ত তুকারামের উপর প্রবচন ইত্যাদির এমন একটা প্রভাব ওঁর উপর পড়ে যে, উনি শিরডী যাত্রার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেন। চিরকালই ভক্তরা এটা অনুভব করেছে যে, যে সদ্‌গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খোঁজে বেরোয়, তাকে ঈশ্বর পদে-পদে সাহায্য করেন। সেই রাতেই ওঁর এক বন্ধু, শঙ্কর রাও ওঁর বাড়ী আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে- "আপনি কি আমাদের সাথে শিরডী যাবেন?" এই কথা শুনে লক্ষ্মীচন্দের মন আনন্দে ভরে ওঠে এবং তক্ষুনি শিরডী যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। এক মারোয়াড়ীর কাছ থেকে পনেরো টাকা ধার নিয়ে এবং অন্যান্য আবশ্যক ব্যবস্থা করে উনি শিরডী অভিমুখে রওনা হন। ট্রেনে বন্ধুর সাথে কিছুক্ষণ ভজন-কীর্তনও করেন। ঐ কামরায় চারজন মুসলমানও বসেছিল, যারা শিরডীর কাছেই নিজেদের বাড়ী ফিরছিল। লক্ষ্মীচন্দ তাদের কাছে শ্রী সাইবাবার বিষয় কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন তারা ওকে জানায়- "শ্রী সাইবাবা শিরডীতে অনেক বছর ধরে আছেন এবং উনি এক খুবই উচ্চ শ্রেণীর সন্ত।" কোপর গ্রামে পৌঁছে লক্ষ্মীচন্দের বাবার জন্য কিছু পেয়ারা কেনার ইচ্ছে হয়। কিন্তু একটু পরই সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দেখতে এতো মগ্ন হয়ে যান যে, পেয়ারার কথা একেবারেই ভুলে যান।। ঠিক শিরডীর কাছাকাছি পৌঁছে ওঁর পেয়ারা কেনার কথা মনে পড়ে। ইতিমধ্যে উনি একটি বৃদ্ধাকে টুকরী নিয়ে টাঙ্গার পেছনে দৌড়ে-দৌড়ে আসতে দেখেন। এই দেখে উনি টাঙ্গা থামান এবং টুকরীতে পেয়ারা দেখে কিছু বালো পেয়ারা কিনে নেন। তখন ঐ বৃদ্ধাটি ওঁকে বলেন- "দয়া করে এই বাকি পেয়ারা গুলোও আমার হয়ে বাবাকে অর্পণ করে দেবেন।" এই কথা শুনতেই লক্ষ্মীচন্দের মনে হয়- "আমার পেয়ারা কেনার যে ইচ্ছেটা ছিল এবং যেটা আমি পরে ভুলে যাই, সেটা এই বৃদ্ধা আমায় মনে করিয়ে দিল।" শ্রী সাইবাবার প্রতি ঐ বৃদ্ধার ভক্তি দেখে ওঁরা দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে যান। লক্ষ্মীচন্দ ভাবতে বাধ্য হন যে- 'যে বৃদ্ধকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এই বৃদ্ধা বোধহয় তাঁরই কোন আত্মীয়া।" শিরডী পৌঁছতেই দূর থেকেই মস্‌জিদে ধ্বজাকে প্রণাম করেন। হাতে পূজোর সামগ্রী নিয়ে মস্‌জিদে পৌঁছন। তিনি বাবার বিধি সম্মত ভাবে পূজা-অর্চনা করে তৃপ্তি অনুভব করেন। বাবাকে দর্শন করে উনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁর চরণ দুটি এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেন, যেমন একটি মৌমাছি পদ্মফুলের মকরন্দের সুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে। তখন বাবা ওঁকে যা-যা বলেন সেটা হেমাডপন্ত নিজের মূল গ্রন্থে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন, "ব্যাটা, রাস্তায় ভজন-কীর্তন করে এবং অন্য লোকেদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অন্যদের জিজ্ঞাসা করার কি দরকার? সব কিছু নিজের চোখেই দেখো। কেন অন্যকে জিজ্ঞাসা করা? স্বপ্ন মিথ্যে

না সত্যি? এবার নিজেই বিচার করে নাও। মারোয়াড়ীর কাছ থেকে ধার নেওয়ার কি দরকার ছিল? মনের ইচ্ছে কি পূরণ হলো?" এই শব্দগুলি শুনে বাবার সর্বব্যাপকতা অনুভব করে লক্ষ্মীচন্দ বিস্মিত হন। ওঁর ভেবে লজ্জা হয় যে, বাড়ী থেকে শিরডী পর্যন্ত রাস্তায় যা যা ঘটেছিল, সে সব কথা বাবা জানতেন। এখানে লক্ষ্য করার মত বিষয় হল এই যে, ঋণ নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে আসা বা ধার করে তীর্থ যাত্রা বা আনন্দোৎসব করা তিনি পছন্দ করতেন না।

'সাঁজা' (এক রকমের সুজীর পায়েস)

দুপুরে খাওয়ার সময় এক ভক্তের কাছ থেকে 'সাঁজা'র প্রসাদ পেয়ে লক্ষ্মীচন্দ খুব খুশী হন। পরের দিনও উনি 'সাঁজা'র আশাতেই বসেছিলেন, কিন্তু সেদিন আর কোন ভক্ত সেই প্রসাদ বিতরণ করেনি। তৃতীয় দিন বাপুসাহেব যোগ বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন কিসের নৈবেদ্য অর্পণ করা হবে? বাবা ওঁকে 'সাঁজা' আনতে বলেন। ভক্তরা দুটো বড় পাত্র ভরে 'সাঁজা' নিয়ে আসেন। লক্ষ্মীচন্দের ক্ষিধেও খুব জোরে পেয়েছিল। ওঁর পিঠেও একটা ব্যথা হচ্ছিল। বাবা লক্ষ্মীচন্দকে বলেন- "তোমার ক্ষিধে পেয়েছে, তাই না? ভালো কথা। কোমরে ব্যথাও হচ্ছে? নাও এবার 'সাঁজা'ই ওষুধ হিসেবে খাও।' লক্ষ্মীচন্দ আবার খুব অবাক হয়ে যান যে, ওঁর মনের সব কথাগুলি বাবা কি করে জেনে ফেললেন। নিশ্চয় উনি সর্বজ্ঞ!

কু-দৃষ্টি ঃ-

এই যাত্রাতেই ওঁর একবার 'চাওড়ী' শোভা যাত্রা দেখার সৌভাগ্য হয়। সেদিন বাবার কাশি ও শ্লেষ্মার দরুণ শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। লক্ষ্মীচন্দ ভাবেন বাবার নিশ্চয়ই কারো নজর লেগে গেছে। তাই তিনি এইরকম কষ্ট পাচ্ছেন। পরের দিন সকালবেলা মস্‌জিদে বাবা শামাকে বলেন, "গতকাল যে আমার কষ্ট হচ্ছিল তার কারণ অবশ্যই কারুর কু-দৃষ্টি। আমার মনে হচ্ছে আমার বোধহয় কারো নজর লাগল। তাই আমার এত কষ্ট হচ্ছে।" লক্ষ্মীচন্দের মনের কথাটা বাবা এইভাবে প্রকাশ করেন। বাবার সর্বজ্ঞতার অনেক প্রমাণ ও ভক্তদের প্রতি বাবার স্নেহ দেখে লক্ষ্মীচন্দ বাবার চরণে পড়ে বলেন- "আপনার অপূর্ব দর্শন পেয়ে খুবই আনন্দ হচ্ছে। আমার মন-মধুপ আপনার চরণ পদ্মে এবং ভজনগানেই যেন নিমগ্ন থাকে। আপনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর আছে বলে আমি জানি না। কৃপা ও স্নেহ দিয়ে এই দাসকে রক্ষা করে তার কল্যাণ করুন। আপনার ভবভয়নাশক চরণ স্মরণ করতে-করতেই যেন আমার

জীবন আনন্দে কেটে যায়, এই আমার আপনার কাছে বিনম্র প্রার্থনা।"

বাবার আশীর্বাদ ও উদী পেয়ে খুবই আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হন। বন্ধুর সাথে সারা রাস্তা বাবার লীলার গুণগান করতে-করতে উনি বাড়ী ফিরে আসেন। বলা বাহুল্য, এর পর উনি বাবার অনন্য ভক্ত হয়ে ওঠেন। শিরডী যাত্রীদের হাতে উনি বাবার জন্য মালা, কর্পূর ও দক্ষিণা পাঠাতেন।

২) বুরহানপুরের মহিলা ঃ-

এবার এই দ্বিতীয় পাখীটির (ভক্ত) বর্ণনা করা হবে। একদিন বুরহানপুরের এক মহিলা স্বপ্নে দেখেন যে শ্রী সাইবাবা ওঁর দরজায় দাঁড়িয়ে খিচুড়ী চাইছেন। ঘুম থেকে ওঠে দরজায় কাউকে দেখতে পান না। তবুও স্বপ্নের কথা ভেবে ওঁর খুব ভালো লাগে এবং নিজের স্বামী ও অন্যান্য লোকেদের স্বপ্নের কথাটা জানান। ওঁর স্বামী ডাক বিভাগে কাজ করতেন। ওঁরা দুজনেই খুব ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যখন অকোলায় স্থানান্তরণ তখন ওঁরা শিরডী যাওয়া স্থির করেন। একটা শুভদিন দেখে শিরডীর জন্য রওনা হন। পথে গোমতী তীর্থ হয়ে ওঁরা শিরডী পৌঁছন এবং সেখানে দুমাস থাকেন। প্রতি দিন ওঁরা মস্‌জিদে যেতেন এবং বাবার পূজো করে আনন্দে নিজেদের সময় কাটাতেন। যদিও ঐ দম্পতি বাবাকে খিচুড়ী ভোগ অর্পণ করতে এসেছিলেন, কিন্তু কোন-না-কোন কারণে চৌদ্দ দিন অবধি ওঁদের সেই সুযোগ আর মেলে না। কিন্তু ঐ মহিলা এই কাজে আর দেরী করতে চাইতেন না। পনেরো দিনের দিন খিচুড়ী নিয়ে মস্‌জিদে পৌছে দেখেন বাবা অন্য লোকেদের সাথে খেতে বসে গেছেন। পর্দা টানা হয়ে গেলে কেউ ভেতরে প্রবেশ করার সাহস করত না। কিন্তু উনি আর এক দণ্ড প্রতীক্ষা করতে পারছিলেন না। হাত দিয়ে পর্দা সরিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে যান। খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে বাবার সেদিন সব চেয়ে আগে খিচুড়ী খেতে ইচ্ছে করছিল। মহিলাটি থালা নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বাবা খুব খুশী হন ও তার থেকেই খিচুড়ীর দলা নিয়ে খেতে শুরু করেন। বাবাকে এইরূপ আগ্রহান্বিত দেখে প্রত্যেকেই খুব অবাক হয়। পরে যে-যে এই খিচুড়ীর গল্পটি শোনে, ভক্তদের প্রতি বাবার স্নেহ দেখে তার খুবই আনন্দ হয়।

মেঘার নির্বান ঃ-

এবার তৃতীয় মহান পাখীর গল্প শুনুন। বিরম গ্রামের মেঘা ছিল রাও বাহাদুর হরি বিনায়ক সাঠের একজন সরল, নিরক্ষর ব্রাহ্মণ রাঁধুনি। সে শিবের পরম ভক্ত

ছিল ও সর্বদা পঞ্চাক্ষরীয় মন্ত্র 'ওঁ নমো শিবায়' এর জপ করত। সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি ও কিছুই জানত না, এমনকি সন্ধ্যার মূল গায়ত্রী মন্ত্র পর্যন্ত জানত না। রাও বাহাদুর ওকে খুবই স্নেহ করতেন। তাই ওকে সন্ধ্যার বিধি এবং গায়ত্রী মন্ত্র শিখিয়ে দেন। 'শ্রী সাইবাবা শিবের সাক্ষাৎ অবতার' এই বলে শ্রী রাওবাহাদুর মেঘাকে শিরডী পাঠাবেন ঠিক করেন। কিন্তু শ্রী সাঠেকে জিজ্ঞাসা করায় মেঘা জানতে পারে যে, শ্রী সাইবাবা তো মুসলমান। তাই মেঘা ভাবে যে, শিরডী গিয়ে এক মুসলমানকে প্রণাম করতে হবে এটা তো ঠিক কথা নয়। সাদাসিধা তো সে ছিলই, তাই ওর মনে অসমঞ্জস সহজেই দেখা দেয়। তখন সে নিজের মালিককে প্রার্থনা করে- "দয়া করে আমাকে সেখানে পাঠাবেন না।" কিন্তু সাঠেসাহের ওর কথা শুনতে মোটেই রাজী ছিলেন না। ওঁর সামনে মেঘার অনুরোধ টিঁকল না। সাঠেসাহেব নিজের শ্বশুর শ্রী গণেশ দামোদর ওরফে দাদা কেলকরকে (যিনি শিরডীতেই থাকতেন) একটা চিঠি লেখেন- 'মেঘার পরিচয় বাবার সাথে করিয়ে দেবেন' এবং মেঘাকে চিঠিটি দিয়ে কোন রকমে শিরডী পাঠিয়ে দেন। শিরডী পৌঁছে মেঘা মস্‌জিদের ঢুকতে যাবে এমন সময় বাবা অত্যন্ত রেগে ওঠেন। ওকে মস্‌জিদে ঢুকতে মানা করে দেন। তিনি গর্জন করে বলেন- "একে বাইরে বার করে দাও।" তারপর মেঘার দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি এক উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং আমি নিম্ন জাতির এক মুসলমান। এখানে এলে তোমার জাত যাবে। তাই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" এই কথা শুনে মেঘা কেঁপে ওঠে এবং খুবই বিস্মিত হয় যে, ওর মনের কথাগুলি বাবা কি করে জানতে পারলেন! কোন ক্রমে ও শিরডীতে কিছুদিন থাকে এবং নিজের সাধ্যমত সেবাও করে। কিন্তু ওর তৃপ্তি হয় না। ও বাড়ী ফিরে আসে এবং সেখান থেকে ত্র্যয়ম্বক (জেলা নাসিক) চলে যায়। পুরো এক বছর পর ও আবার শিরডী আসে এবং এবার দাদা কেলকরের বলাতে মস্‌জিদে ঢোকার সুযোগও পায়। শ্রী সাইবাবা মৌখিক উপদেশ দ্বারা মেঘার উন্নতি করার চেয়ে ওর হৃদয় পরিবর্তন বা আন্তরিক সংশোধন করতে চাইছিলেন। ফলে মেঘার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। এখন ও শ্রী সাইবাবাকে শিবেরই সাক্ষাৎ অবতার বলে মানত। শিব পূজোয় বেলপাতা নিতান্তই আবশ্যক। নিজের শিবের (শ্রী বাবা) পূজোর জন্য বেলপাতার খোঁজে সে অনেক দূর অবধি চলে যেতো। প্রতিদিনের তার এই নিয়ম ছিল যে, গ্রামে যতগুলি দেবালয় আছে, আগে সেখানে গিয়ে পূজো করত এবং তার পর মস্‌জিদে এসে বাবাকে প্রণাম করে কিছুক্ষণ চরণ সেবা করে চরণামৃত পান করত। একবার খণ্ডোবা মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকায় পূজো না করেই মস্‌জিদে ফিরে আসে। কিন্তু মস্‌জিদে বাবা ওর সেবা স্বীকার করেন না এবং ওকে আগে খাণ্ডোবা মন্দিরে

পূজো করে আসতে বলেন। বাবা ওকে জানান যে, মন্দিরের দ্বার খুলে গেছে। যথারীতি পূজো করে ফিরে আসার পরই বাবা ওকে তাঁর পূজো করার অনুমতি দেন।

গঙ্গাস্নান ঃ-

একবার মকর সংক্রান্তির দিন মেঘার ইচ্ছে হয় যে, সে বাবাকে চন্দন লাগিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করাবে। বাবা প্রথমে এ বিষয়ে স্বীকৃতি দেন না। কিন্তু ওর নিরন্তর প্রার্থনার পর উনি কোনরকমে রাজী হন। গোদাবরী নদীর পবিত্র জল আনার জন্য আট ক্রোশ দূরে যেতে হতো। দুপুরের মধ্যে মেঘা সব ব্যবস্থা করে ফেলে। এরপর ও বাবাকে তৈরী হয়ে নিতে বলে। বাবা আবার মেঘাকে অনুরোধ করেন- "আমায় এই ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতে দাও। আমি তো এক ফকির, গঙ্গাজলে স্নান করে কি করব?" কিন্তু মেঘা কোন কথা শুনতে রাজী নয়। তার দৃঢ় ধারণা- 'শিবঠাকুর গঙ্গাজল পেয়ে খুব প্রসন্ন হন। তাই এই রকম শুভ পর্বে নিজের শিবঠাকুরকে স্নান করানো আমাদের পরম কর্তব্য।' এবার বাবাকে রাজী হতেই হলো। বাবা নীচে নেমে একটা পিঁড়িতে বসে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বলেন- "শুধু মাথাতেই জল ঢেলো। মাথাই শরীরের প্রধান অঙ্গ। তার উপর জল ঢালা আর পুরো শরীরের উপর জল ঢালা সমান।" মেঘা, 'আচ্ছা, আচ্ছা' বলতে-বলতে পাত্রটা বাবার গায়ে উপুড় করে দিল। তারপর খালি পাত্রটা একদিকে রেখে, বাবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। একি আশ্চর্য কাণ্ড! বাবার কেবল মাথাটাই ভিজেছে এবং বাকী শরীরটা যেমন কে তেমন শুকনোই রয়েছে।

ত্রিশুল এবং পিণ্ডী ঃ-

মেঘা বাবাকে দু জায়গায় পূজো করত। প্রথমে মস্‌জিদে সশরীরে বাবাকে পূজো করত এবং তারপর ওয়াড়ায় ফিরে নানাসাহেব চাঁদোরকরের দেওয়া বড় ছবিটাকে। এই ভাবে এই ক্রম বারো মাস চলে। বাবা ওর ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য ওকে দর্শন দেন। একদিন ভোরবেলা যখন মেঘা অর্দ্ধ নিদ্রাবস্থায় বিছানায় শুয়েছিল, তখন ও বাবার দর্শন পায়। বাবা ওকে জাগ্রত ভেবে কিছু কুমকুম মেশানো চাল ("অক্ষত") ছড়িয়ে দেন এবং বলেন- "মেঘা, একটা ত্রিশুল আঁকো।" এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। মেঘা উৎসুক হয়ে চোখ খোলে কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। শুধু এখানে-ওখানে চালের দানা ছড়ানো ছিল। এরপর মস্‌জিদে গিয়ে বাবাকে নিজের স্বপ্নের কথা বলে ত্রিশুল টানার অনুমতি চায়। বাবা বলেন- "তুমি কি আমার কথা

শোননি? আমি তো বললাম 'ত্রিশুল আঁকো।' ওটা কোন স্বপ্ন নয় বরং আমারই প্রত্যক্ষ আদেশ। আমার কথা সর্বদা অর্থপূর্ণ হয়, আমি আজে-বাজে কথা বলি না।" মেঘা সে কথা স্বীকার করে বলেন- "আপনি দয়া করে আমায় ঘুম থেকে জাগিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু সব কটি দরজা বন্ধ দেখে এই মূঢ় ব্যক্তির ভ্রান্তি হয় যে, বোধহয় সেটা স্বপ্নই ছিল।" বাবা উত্তর দেন- "প্রবেশ করার জন্য আমার কোন দরজার দরকার হয় না। যে আমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সর্বদা আমারই চিন্তন করে, তার সব কাজ আমিই স্বয়ং করি এবং শেষে তাকে শ্রেষ্ঠ (চরম) গতি প্রদান করি।" মেঘা নিজের বাসস্থানে ফিরে বাবার ছবির কাছে দেওয়ালে একটা লাল ত্রিশুল আঁকে। পরের দিন এক রামদাসী ভক্ত পুণে থেকে শিরডী এসে পৌঁছয়। ও বাবাকে প্রণাম করে একটি শিবলিঙ্গ উপহার দেয়। সেই সময় মেঘাও সেখানে এসে পৌঁছয়। তখন বাবা ওকে বলেন- "দেখো, ভোলাশঙ্কর এসে গেছেন। এবার এঁকে সামলাও।" মেঘা তার উপর ত্রিশুল আঁকা দেখে মহান বিস্মিত হয়। কাকা সাহেব দীক্ষিত স্নান করে মাথার উপর গামছা দিয়ে, 'সাই' নাম জপ করছিলেন। এমন সময় মানস চক্ষে দেখলেন এক শিবলিঙ্গ। ওঁর একটু কৌতুহল হয়। ঠিক সেই সময় মেঘা মস্‌জিদ থেকে ফিরছে। মেঘা বাবার দেওয়া শিবলিঙ্গটি কাকাকে দেখায়। শিবলিঙ্গটি ঠিক সেরকমই ছিল, যেমনটি কাকাসাহেব একটু আগে দেখেছিলেন। ত্রিশুল টানার কিছুদিনের মধ্যেই বাবা বড় ছবিটির (যেটির পূজো মেঘা নিত্য করত) কাছে ঐ লিঙ্গটি স্থাপনা করে দেন। মেঘা শিব পূজো খুব ভালবাসত। ত্রিশুল টানার সুযোগ দিয়ে ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে বাবা ওর বিশ্বাস দৃঢ় করে দেন।

এই ভাবে অনেক বছর ধরে দুপুর ও সন্ধ্যার সময় নিয়মিতভাবে আরতি এবং পূজো করে ১৯১২ সালে মেঘা পরলোক গমন করে। বাবা ওর মৃত শরীরের উপর হাত বুলিয়ে বলেন, "এ আমার সত্যিকারের ভক্ত ছিল।" তারপর বাবা নিজের খরচায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাবার আদেশ দেন, যেটা কাকাসাহেব দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ চতুর্থ বিশ্রাম